OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 07 - 16
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জনজীবন : প্রসঙ্গত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

ছন্দমঞ্জরী চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : manjareec96@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Upper strata, Lowborn, Dalit, Mangalkavya, Society, Dignity, Deprived, Domination, Struggle

Abstract
Literature mirrors the society in which it is written. The medieval Bengali literature is not an exception. The Mangal kavyas are one of the most significant subgenres of poetry written in Bengali during this era. The 'Manasa Mangal' and the 'Chandimangal' kavyas are the two of the most notable ones. Following the common tradition of Mangalkavyas, they sing the greatness of Manasa and Chandi. The two kavyas mainly narrate the stories of two non-Aryan goddesses accepting the challenges for the upliftment of their status to that of the chief goddesses of the superior Aryan society. It is as if another kind of class struggle of the deprived people for equality and dignity. In Manasamangal goddess Manasa is dishonored repeatedly as low caste by the upper caste merchant Chand Sadagar. For this reason Manasa forms public opinion with the help of numberless people from the lower strata of society who somehow are also subjugated by Chand Sadagar. Manasa now leads these people. This struggle for gaining the social rights of equality and dignity under the leadership of Manasa succeeds in the end. The upper class has to submit to this combined strength of the deprived. In a similar way the 'Banikkhanada' of Mukundaram's 'Chandimangal' depicts the struggle of goddess Chandi against dominant merchant Dhanapati. But Chandi's is her own struggle against deprivation, no combined strength of class struggle works here. But in the 'Byadhkhanda' of the same the plot centres around the struggle of Kalketu as a person from the deprived class of society. He in his life of a hunter has to undergo many sufferings in the hands of the dominant class. Even when he achieves kingship he has to bow down to the upper class. He is unable to oppose his humiliations rather is compelled to surrender to them. The two Mangal kavyas also record several pitiful events of the oppression of deprived lowborn people as well as the dalits and portray their struggles of class consciousness that are flowing like undercurrents in the body of the main narratives.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১

> "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা প্রতিপালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে – জীবন-যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে - উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"[১]

'রাশিয়ার চিঠি'-তে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের বঞ্চিত, অবহেলিত, শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে এককথায় যাদের 'দলিত' বলা হয়। চতুর্বর্ণের শেষ বর্ণ ও চতুর্বর্ণের বাইরে যে খণ্ডিত, বিভক্ত শ্রেণি যারা এদেশের আদি অধিবাসী সেই অনার্য জাতি, বৈদিক যুগ থেকে যারা পরিচায়িত হয়েছে রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি ঘৃণাবাচক শব্দবলয়ে তারাই বর্তমানে অন্ত্যজ বা ব্রাত্য বা দলিত নামে পরিচিত। এই সকল প্রতিশব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই শ্রেণির মানুষের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ের বহু প্রাচীন স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যত। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পাদদ্বয়কে এই শ্রেণির উৎপত্তিস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদী আর্যদের রচিত সুপ্রাচীন গ্রন্থ ঋকবেদ। রথের রশির মতো বিপুলায়াতন সভ্যতার রথটিকে আজন্মকাল টেনে চলেছে অথচ এই অন্ত্যজরা সমাজে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। দেবমূর্তির স্রষ্টা হয়েও দেবপূজায় নেই এদের অধিকার। বৈষম্যের এই রাজনীতি যুগ যুগ থেকে চলে আসছে। প্রজাপালক রামচন্দ্রের হাতেও তার অন্যথা হয়নি। তিনিও পরিচালিত হয়েছিলেন উচ্চবর্ণের কূটনীতির দ্বারা। তাইতো বনগমনকালে যে রামচন্দ্র গুহকচণ্ডালকে জড়িয়ে ধরেছেন মিত্ররূপে, সম্রাট হয়ে শূদ্র শম্বুককে তিনিই ছল করে হত্যা করেছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে। সমাজ তো বটেই সামাজিক দর্পণ যে সাহিত্য তা প্রবর বর্ণের দ্বারা সৃষ্ট। তাই সেখানে মুখ্য ভূমিকাতে এই প্রবরবর্গকেই দেখা গেছে। অবরেরা এসেছে গৌণভাবে। সাহিত্যে তারা চির উপেক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগও তার ব্যতিক্রম নয়। খ্রিস্টিয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে শাসকের পালাবদলের সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বদল ও সংমিশ্রণ সামাজিক স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিয়েছিল। হিন্দুধর্মের জটিল অচলায়তনের প্রাচীরে বৌদ্ধধর্মই প্রথম আঘাত হেনেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে তাই বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া পন্থায় আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্মের আশ্রয়ে এসেছিল সমাজের নিম্নশ্রেনীর মানুষেরা। একমাত্র সেই সুদূর চর্যার যুগেই তারা পেয়েছিল ধর্মচর্চার সাথে সাথে সাহিত্যচর্চার অধিকার। ডোম্বীপাদ, শবরপাদ, তন্ত্রীপাদের কথা পাই যারা বাংলা ভাষায় প্রথম দলিত সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সান্ধভাষার অন্তরালে যারা নিজেদের সমাজের কথা, উচ্চবর্গের হীনতার কথা বলতে পেরেছিলেন। চর্যার যুগের পর আসে দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অন্ধকার যুগ। হিন্দুধর্মের শিকড়ে জোরে টান পড়ে বিজাতীয় শাসকের বিজাতীয় ধর্মের আঘাতে। সেই ইতিহাস আত্মস্থ করেই তৈরি হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি। উচ্চবর্গের প্রতিনিধিরা হিন্দুধর্মের ক্ষীণ স্রোতধারাকে মিশিয়ে দিতে চাইলেন লোকজ ধর্মের সাথে। পৌরাণিক দেবদেবীরা মিশে গেলেন লৌকিক দেবদেবীর সাথে। ধ্যানী যোগী দেবাদিদেব মহাদেব পরিণত হলেন সাধারণ গৃহস্থ কৃষকে। হিমালয়দুহিতা পার্বতী পরিণত হলেন পশুরক্ষাকর্ত্রী দেবী চণ্ডীতে। এভাবেই সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের লোকজ ধ্যানধারণাকে, বিশ্বাসকে নিজ ধর্মে মেলাতে বাধ্য হয়েছিল বিপন্ন হিন্দুধর্মের ধারকেরা। অন্যদিকে, লৌকিক দেবদেবীরও বিপরীতমুখী প্রয়াস চলেছিল পৌরাণিক মর্যাদা লাভের জন্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই শাখা 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য দুটিতে দুজন অনার্য দেবীর আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সেই কাহিনি রয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল উচ্চবর্ণ পরিচালিত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। দুই দেবীর সেই প্রচেষ্টা যেন উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে গিয়ে মধ্যযুগীয় সমাজের অবহেলিত, অস্পৃশ্য অন্ত্যজজনের সামাজিক মর্যাদা লাভ করার কাহিনি। কাব্যদুটিতে দেবকথার আড়ালে থাকা সেইসব বঞ্চিত মানুষের প্রতিরোধের কাহিনি তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে এই প্রবন্ধে।

২

'মনসামঙ্গল' কাব্য আলোচনার পূর্বে দেবী মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মনসা হলেন সর্পের দেবী বা নাগেদের দেবী। যে দেবীর পূজার প্রচলন ভারতীয় আর্য সমাজে ছিল না। প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে এই নাগপূজা ছিল। এছাড়া মহাভারতে নাগজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়; যারা টোটেম হিসবে সাপের ফণাকে ব্যবহার করত। মনসামঙ্গলের কাহিনি কোনো পুরাণপ্রসূত নয় তা লৌকিক কাহিনি। মনসামঙ্গল কাব্যে আরেকটি নারী চরিত্রের কথা পাই তিনি হলেন মনসার সহচরী, তার সর্ব কাজের সহায়ক ও পরামর্শদাত্রী নেতা। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই নেতা চরিত্রের উৎস সন্ধান করেছেন এইভাবে -

> "মনে হয় কোন রজকের কন্যা বিষনাশকারী কতকগুলি প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভ করিয়া কালক্রমে সাধারণ জনগণের মধ্যে দেবীত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর।"[২]

এই মন্তব্যে একথা বেশ স্পষ্ট যে নেতা কোনো পৌরাণিক চরিত্র নয়। সে এই মর্ত্যেরই সাধারণ মানবী যে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিল নিজ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করে। একই যুক্তিতে মনসাকেও একজন নিম্নবর্ণের মানবী বলা যায়, যার সংগ্রাম চলেছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের। সে অনার্য-বংশদ্ভূতা তাই আর্যসমাজে নিজ পরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তার সঙ্গী হয়েছিল একজন অভিজ্ঞ অন্ত্যজ নারী নেতা ধোপানী। এদের মিলিত লড়াই চলেছে উচ্চবর্গের সবথেকে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের নেতা চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে অগণিত নিম্নশ্রেণির মানুষেরা যারা শোষিত, নির্যাতিত হয়েছে চাঁদ সদাগরের দ্বারা। মনসা যেন এদের সকলের নেত্রী।

আবার মনসাকে 'মনসামঙ্গল'-এর কবিরা যে পৌরাণিক আবরণে তাঁর অনার্য পরিচিতিকে বা লৌকিক পরিচিতিকে আড়াল করতে চেয়েছেন সেই কাহিনিটিতে মনসা হল দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা। মনসার বাস পাতালে। অপর দিকে নেতার জন্ম মহাদেবের স্বেদবিন্দু থেকে। স্বর্গের দেবদেবীর নজরে এরা হীন। নেতা পেয়েছে দেবদেবীর বস্ত্র পরিষ্কারের কাজ। অন্যদিকে মনসা পেতে চেয়েছে স্বর্গীয় দেবীর মর্যাদা। দেবী মনসাকে ও 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনিকে এভাবে দেখলে শেষপর্যন্ত মর্যাদা লাভের কথাটাই বড় হয়ে ওঠে। তা সে একজন লৌকিক দেবীর পৌরাণিক দেবীর মর্যাদা লাভের কাহিনিই হোক কিম্বা প্রান্তজনের দলনেত্রী রূপে সম্মান, অধিকার, হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লড়াই।

মনসা উচ্চবর্গের দ্বারা পূজিত হলে তবেই পৌরাণিক দেবীর সম্মানে সম্মানিত হবে। দেবসমাজের এরূপ শর্তে মনসার লড়াই শুরু হয়েছিল। এই উচ্চবর্গের প্রধান প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর। সে সপ্তডিঙা ভরে ধনসম্পদ নিয়ে আসে দেশ-বিদেশ থেকে। সে স্বর্গবাসী দেবতাদেরও দেবতা মহাদেবের ভক্ত। তাই স্বর্গীয় দেবীর মর্যাদাহীন মনসার প্রতি তার রয়েছে তাচ্ছিল্য মিশ্রিত তীব্র ঘৃণা। প্রতিপত্তিশালী চাঁদ তার নগর থেকে বিতাড়িত করেছে অন্ত্যজ নাগজাতিদের যারা মনসার অনুগত। মনসা বুঝতে পেরেছিল চাঁদকে পূজারী রূপে পেতে হলে অর্থাৎ নিজ মর্যাদা আদায় করতে হলে নাগজাতির মতো চাঁদ সদাগরের রাজ্যে অন্যান্য অবহেলিত, নির্যাতিত, অস্পৃশ্য সকল মানুষকে নিজ পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। তাই সে সমাজের অন্তেবাসী মানুষের কাছে নিজেকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। যারা শক্তিহীনবলে পরিচিত তাদের মিলিত শক্তিই উচ্চবর্গকে বাধ্য করবে মনসাকে তথা ব্রাত্য সমাজের এক প্রতিনিধিকে সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে।

মধ্যযুগীয় সমাজ বিভিন্ন বৃত্তি ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সেইসমস্ত বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তিধারী মানুষের সামাজিক অবস্থানের ছবি পাওয়া যায়। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের পাশাপাশি মনসামঙ্গল কাব্যে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণির সেইসব মানুষের অতিসাধারণ জীবনযাপনের ছবি। যেমন কাব্যের প্রথমদিকে রাখাল সমাজের কথা পাই। সেখানে মনসার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তাদের কাছে দুধ চাওয়ার এবং কাঙালি ও 'বাদিয়ার মায়্যা' ভেবে রাখাল কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার কাহিনি রয়েছে। এই ঘটনাতে দুটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়। প্রথমত, রাখলরা ব্রাত্য হলেও ব্রাত্য জনজীবনের মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল। তারা বেদে সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখত সেইজন্য এই শ্রেণির মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারণ এরা অত্যাচারিত হত উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণির হাতে। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণী বৃদ্ধাবেশী মনসাকে উত্যক্ত করার ফলে সে রাখালদের গোধন হরণ করেছে এই ঘটনায় উচ্চবর্গের শ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসাবে পরিচিত

ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করার ফল যে কতটা ভয়ানক হতে পারে সেই বার্তাই যেন এখানে ঘোষিত হয়েছে। তবে, মনসার লক্ষ্য যেহেতু চাঁদকে পরাজিত করা তাই সে সর্বপ্রথম নিম্নবর্ণের রাখাল সমাজকে নিজপক্ষে এনেছে। প্রতাপশালী হাসন কাজী রাখালদের উপর অত্যাচার করলে মনসার নির্দেশে ব্রাত্য নাগজাতি অত্যাচারী হাসন কাজীকে পর্যুদস্ত করেছে-

"বেড়িল নাগের দল অতি ভয়ঙ্কর।
...
ভাগে ভাগে বেরিল নাগের পাটোয়ায়।
মাজিল হাসন হাটী নাহি প্রতিকার।।"[৩]

এছাড়া পাটনী, গোয়ালিনী, মালিনি, ডোমনী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর উল্লেখ কাব্যে পাই। মনসা জন্মের পূর্ব কাহিনিতে দেখি শিবের পাটনী বেশী পার্বতীকে দেখে কামার্ত হওয়ার ঘটনা। বৃদ্ধ শিবের পাটনীর প্রতি এই ধরণের হীন আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীর সামাজিক সত্যটি। উচ্চবর্ণের কাছে নিম্নবর্ণের মানুষেরা অচ্ছুত হলেও সময় বিশেষে নিম্নবর্ণের নারীদের সাহচর্যে তাদের জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকে না। শিব তাই বলে -

"সম্বিধান দেহ মোরে পাটনীর ঝি।
তুয়া আলিঙ্গন বিনে আমি নাঞি জি।।"[৪]

এর উত্তরে পাটনী বলেছে - "হেনকর্ম আমরা না করি কোন কালে"[৫] অর্থাৎ দরিদ্র হলেও এধরনের হীনতা তাদের সমাজে নেই। শুধু মধ্যযুগেই নয় চিরকাল অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীরা উচ্চবর্ণের পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। চাঁদসদাগরও নিম্নবর্ণের পূজিত দেবীকে বারংবার 'লঘুজাতি কানী' বলে অপমান করেছে অথচ অন্ত্যজ শ্রেণিরই বেশ্যা বা নটীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। ডোমনী বেশী বেহুলার উক্তিতে ডোম সমাজের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় -

"অতি কুলহীন মোরা হই ডোম জাতি।।
ধুচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি ডালা।
সিয়নী বিয়নী বুনি আর বুনি কুলা।।"[৬]

সামাজিকভাবে এরা কুল ও গোত্রহীন হয়ে সমাজের প্রান্তে বসবাস করত। ডালা, কুলো এসব বানিয়ে ডোম নারীরা নগরের ভিতর বিক্রয় করত। অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা তাদের সমাজে অন্তঃপুরবাসিনী ছিল না। স্বাধীনভাবে তারা জীবিকা অর্জন করতে পারত।

রাখাল সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মনসার পরবর্তী লক্ষ্য হয় জেলে সমাজ। কাব্যে রয়েছে জালু-মালু বা জেলে-মালো সম্প্রদায়ের কাহিনি। এই কাহিনির দ্বারা সমাজের উচ্চবর্ণের হাতে নিপীড়িত, অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের মানুষের বিভীষিকাময় জীবনযাত্রার ছবিই উঠে আসে। এরাও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। এদের জীবিকা মাছ ধরা। চম্পক নগর প্রান্তে এদের বাস। তারা চাঁদবেনের দাস। তাই চাঁদবেনের 'শতভার মৎস্য' আনয়নের ভার পড়ে তাদের উপর। এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করা জালুমালুর পক্ষে সম্ভব নয় তাই বাধ্য হয়ে তারা নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করতে চায়। তৎকালীন সমাজে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের বাসভূমি ত্যাগ বোধ হয় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু চাঁদ সদাগর তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয় –

"মৎস্য নাহি দিবে যদি গাড়ি একুঠাঁই।।"[৭]

এর প্রতিবাদ তারা করতে পারেনি তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। মনসা এই চরম সময়টির সদ্ব্যবহার করে জালু-মালুর পাশে দাঁড়িয়েছে। মনসার সাহায্য লাভের পর জালু-মালুর সংসারে উন্নতি দেখে চাঁদের স্ত্রী সনকা বিস্মিত হয়ে যা বলেছে তাতে অন্ত্যজ শ্রেণির দারিদ্র্যজীর্ণ জীবনই ধরা পড়ে -

"অতি বড় দুঃখী ছিল জালু মালু দাস।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চালেতে না ছিল খড়, পরিবারে বাস।।
মোর বাড়ি ভাড়া ভান্যা আন খুদকুড়া।
মৎস্য কুটিয়া আন তার পোঁটা মুড়া।।"[৮]

চাঁদ বণিক ও সনকার জালু-মালুকে 'দাস' সম্বোধনে মধ্যযুগেও যে দাসপ্রথা ছিল তা বোঝা যায়। পরিবারের সকলে মিলে বিত্তশালী গৃহে এই সমস্ত ব্রাত্যজনেরা বেগার খাটত। মেয়েরা দাসীবৃত্তি করে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বর্জিত অংশে সংসার চালাত আর পুরুষদের যে কোন সময় সামান্য মূল্যে ইচ্ছেমতো খাটিয়ে নিত চাঁদের মতো ধনবান ব্যক্তিরা। এহেন অন্ত্যজ পরিবারে ধুমধাম করে মনসার পুজো হয়েছে। চাঁদের সাম্রাজ্যে বাস করে নিম্নবর্ণের দরিদ্রপ্রজার এরূপ আস্পর্ধায় চাঁদ স্তম্ভিত হয়েছে। মনসাকে কেন্দ্র করে তাদের এই উৎসব যেন আধিপত্যকামী চাঁদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রার প্রথম সূচনা।

চাঁদসদাগরের মতো সামন্ত প্রভুর অত্যাচারের আরও ছবি রয়েছে। লোহার বাসর ঘর বানানোর জন্য তারাপতি কর্ম্মকারকে চাঁদ শুধু নিয়োগ করেনি মৃত্যুভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করেছে -

"স্ত্রী-পুত্রের দয়া থাকে প্রাণে থাকে ডর।
সবে মিলি কর ঘর লোহার বাসর।।"[৯]

শ্রমজীবী এই সব মানুষেরা বেশিরভাগই নিম্নবর্ণের। দূরে সরিয়ে রাখলেও এদের সহযোগিতা ছাড়া চাঁদ বণিকের জীবন যাপন করা দুষ্কর। অথচ বারংবার প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখলে বোঝা যায় অন্ত্যজজনের জীবনের কোনো মূল্য ছিল না উচ্চবর্ণের কাছে।

বানিজ্যে যাওয়ার পূর্বে নৌকা মেরামতির জন্য চাঁদ সদাগর সূত্রধরদের নিয়ে আসতে তার চাকড় ধনাকে পাঠায়। ধনা তাদের ধরে আনতে গিয়ে বেঁধে আনে -

"যত বন্ধকী বান্ধে হাতে গলায়।
ততক্ষণে মেলে গিয়া সদাগর যথায়।।"[১০]

সামন্তপ্রভু চাঁদ সদাগরের ছিল চাকর ধনার মতো লোকবল। এদেরই সাহায্যে সে শ্রমজীবী সকল মানুষকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখত। ধনাও নিশ্চিত রূপে নিম্নবর্ণেরই একজন অথচ নিজের শ্রেণির প্রতি নেই তার সহমর্মিতাবোধ। আসলে চাঁদ আশ্চর্য কৌশলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের একে অপরের শত্রু বানিয়ে রেখেছে। নিম্নবর্ণের শ্রেণিচেতনাকে আচ্ছাদিত করে রাখার এ ছিল সামন্তপ্রভুদের এক কূটচক্রান্ত।

চাঁদের ছিল মহাজ্ঞান ও নাগজাতিদের জব্দ করার জন্য শঙ্কর গাড়ুরির মতো ব্যক্তি। তাই মনসার নেতৃত্বে চাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নাগেদের বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু নির্যাতিত নাগজাতি সহজে পরাজয় স্বীকার করে নি। চাঁদকে জব্দ করতে তাই ব্রাত্য নাগজাতিরা মনসার শরণাপন্ন হয়েছে। মনসাকে চাঁদের অতিলৌকিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে অন্ত্যজ নারী নেতা ধোপানী। মনসা চাঁদের রাজ্যে পরাজিত ব্রাত্য নাগজাতির সাহায্যে চাঁদের ওই দুই প্রধান শক্তি কেড়ে নিয়েছে। নাগেরা মনসার নেতৃত্বে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করে তার মনোবল যেমন ভেঙে দিয়েছে তেমনি যে অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে চাঁদ দরিদ্র প্রজার উপর আধিপত্য বজায় রাখে; বাণিজ্যে প্রাপ্ত সেই সকল ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে নাগেরা তাদের উপর হওয়া সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে।

চাঁদ সদাগর ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচার, উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে সকল শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষেরা চাঁদের প্রতিপক্ষ মনসাকে এভাবেই আঁকড়ে ধরেছে। তারা এই অবিচারের বিচার চেয়েছে। মনসা তাদের কাছে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু চাঁদ তাদের দেবীকেও চূড়ান্ত অমর্যাদা করেছে। বাণিজ্যে যাওয়ার পূর্বেই মনসার মন্দির ধ্বংস করে নৌকার মাঝিদের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে। কাব্যে দেখানো হয়েছে মনসার পরামর্শে কখনো কর্মকারেরা লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র রেখে, কখনো নৌকার মাঝিরা সপ্তডিঙার হাল ছেড়ে দিয়ে মনসাকে সাহায্য করেছে চাঁদ সদাগরকে পর্যুদস্ত করতে। আসলে, চাঁদ বণিকের নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মনে দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়েছিল,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যার বহিঃপ্রকাশ এতদিন সম্ভব হয়নি। মনসার মতো কুশলী নেত্রীর পরিচালনায় তাদের সেই ক্ষোভ তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে যেন কখনো বিদ্রোহের আকারে, আবার কখনো প্রতিশোধের আকারে সঠিক পথে রূপায়িত হয়েছে। মনসাও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মনসা কৌশলে চাঁদকে লোকবলহীন করেছে। চাঁদের স্ত্রী সনকা ও পুত্রবধূ বেহুলার কাছে মনসার দৈবীশক্তি প্রমাণিত হয়েছে, তাই তারা মনেপ্রাণে মনসাকে ভক্তি করতে শুরু করেছে। ঘরে-বাইরে সবাই চাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে মনসাকে দেবী হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। ক্ষমতাশালী উদ্ধত চাঁদের লোকবল ও মনোবল কেড়ে নিয়ে শেষপর্যন্ত চাঁদকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে মনসা। এইভাবে মনসার নেতৃত্বে নিম্নবর্ণের সকল মানুষের নীরব লড়াই চাঁদকে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

৩

মঙ্গল কাব্যধারার অন্তর্গত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখ্যানে রয়েছেন দেবী চণ্ডী। দেবী মনসার মতো এই দেবীও অনার্যসংস্কৃতিসম্ভূতা। এ ব্যাপারে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন –

> "... বৈদিক সংহিতায় চণ্ডীর নাম নাই, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোনো পুরাণেও এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই।"[১১]

দেবী চণ্ডী অরণ্যের দেবী, পশুকুল রক্ষাকর্ত্রী। বন্যপ্রাণীর মতো অরণ্যচারী অন্তেবাসী মানুষেরও আরাধ্যা। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ড'-এ দেবীর গোধিকারূপ ধারণের মধ্যে সেই অনার্য কৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। প্রাচীন ভারতে গোধা নামক এক জনজাতি ছিল। যারা টোটেম হিসেবে গোধা বা গোধিকা ব্যবহার করত। মহাভারতেও এদের উল্লেখ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন গোধাবাহিনী দেবী 'চাণ্ডী' হল 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দেবী চণ্ডী। এই কাব্যেরই 'বণিক খণ্ড'-এ দেবী চণ্ডীর 'কমলেকামিনী' রূপ দেখা যায় যে রূপের সাথে পার্বতী, গজলক্ষ্মী দেবীর রূপ মিলে গেছে। 'মনসামঙ্গল'-এর দেবী মনসার মতো এখানে দেবী চণ্ডীর বণিক সমাজে পূজাপ্রচারের কাহিনি রয়েছে। চাঁদ সদাগরের মতো প্রতিপত্তিশালী বণিক ধনপতিও অনার্য দেবী চণ্ডীকে দেবী হিসেবে মর্যাদা দিতে রাজি নয়। তাই ধনপতির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে চণ্ডীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিন্তু সেই সংগ্রাম তার একার। মনসামঙ্গলের মতো অন্ত্যজজনেরা সেই লড়াইয়ে সামিল হয়নি। বণিক ধনপতির গার্হস্থ্য জীবন ও বাণিজ্যযাত্রাকে কেন্দ্র করে এই খণ্ডের সমগ্র ঘটনা আবর্তিত হয়েছে।

অন্যদিকে 'আখেটিক খণ্ড'-এর কাহিনি সম্পূর্ণ পৃথক। 'আখেটিক খণ্ড'-এর কাহিনি কালকেতু ও ফুল্লরা নামের এক ব্যাধদম্পতিকে কেন্দ্র করে। তারা কীভাবে দেবী চণ্ডীর কৃপা লাভ করেছে সেই কাহিনিই এখানে বর্ণিত। সরল বন্য এই সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চণ্ডীকে কোনো বাধা পেতে হয়নি। অন্ত্যজ সমাজে তার প্রতিষ্ঠা সহজেই হয়েছে। কিন্তু তার ভক্ত কালকেতু নিম্নবর্ণের হওয়ায় সামাজিক মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে তাকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'আখেটিক খণ্ড'-এর কাহিনি তাই সমাজের উচ্চ শ্রেণির বিরুদ্ধে কালকেতুর সংগ্রামের কাহিনি। জাতিতে ব্যাধ হওয়ায় চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের বাইরে তাদের বাস। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের সমাজের সাথে তারা সম্পর্কহীন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কর্তৃক কালকেতুর শারীরিক মানসিক আচার-আচরণের যে পরিচয় পাই তা থেকে ব্যাধসমাজ সম্পর্কে উচ্চশ্রেণির মনোভাব স্পষ্ট হয়। কবি কাব্যের প্রথমদিকে কালকেতুর আহারের বর্ণনা করেছেন এইভাবে -

> "শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিটকাল
> ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তা ল।
> ভোজনসমইয়ে গলা করে ঘড়ঘড়
> কাপড় ঊষাষ করে যেন মরাই-বড়।"[১২]

অন্ত্যজ সমাজের মানুষ সম্পর্কে সঠিক পরিচিতির অভাবই কি কবির এই বর্ণনার সহায়ক হয়েছে নাকি অরণ্যচারী হওয়ায় তাদের আহার রুচিহীন ও অমার্জিত হবে তা কবি শুধুমাত্র কল্পনাই করেছেন? আবার, ফুল্লরা কালকেতুকে যে সমস্ত খাবার

পরিবেশন করেছে তাতে মিষ্ট জাতীয় খাবারের বা ঘৃতের ব্যবহার নেই। শুধুমাত্র দইয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়টি থেকে এটা ধারণা করা অমূলক হবে না যে উচ্চমানের কিছু খাদ্য ব্রাত্যজীবনে হয়তো নিষিদ্ধ ছিল।

কালকেতু নিম্নবর্গের মানুষ হওয়ায় চাষবাস করার অধিকার তার নেই। সে বনে বনে পশু শিকার করে আর সেইসব শিকার করা পশুর মাংস, চামড়া তার স্ত্রী ফুল্লরা হাটে বিক্রি করে দিনযাপন করে। তাদের এতটাই দৈন্যদশা যে একদিনের শিকারের অভাবে তাদের ঋণ করতে হয়। অভাব-অনটনের সংসার অন্ত্যজ সমাজের সকলেরই তবুও বিপদে এরা একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। ফুল্লরা তাই ছুটে গেছে তার সইয়ের কাছে দু-মুঠো চাল ধার করতে। সইকে আক্ষেপের সুরে জানিয়েছে -

> "বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা
> চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।"[১৩]

আবার ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে ফুল্লরার বারমাস্যা বিবরণে সেই দারিদ্র্যের চরম রূপই প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নতুন মাসের সাথে আসা দুঃখ-কষ্ট তাদের জীবন দুর্বিষহ তো করে তোলেই, যে সকল মাসে 'সুখী জগজন'[১৪] সেসব সময় তাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া নিম্নশ্রেণির মানুষদের আরও বিপদে ঠেলে দেয়। ফুল্লরা আক্ষেপের সুরে বলে উৎসবের আনন্দে যখন -

> "উত্তমবসন বেশ করয়ে বনিতা
> অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।"[১৫]

শীত উপভোগ বা উৎসব আয়োজন তাদের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য আনে না। বেশভূষার প্রতি নারীর থাকে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ। কিন্তু অভাবের জ্বালায় ফুল্লরাকে সেসব সাধ বিসর্জন দিতে হয়েছে। দু-মুঠো আহারের ব্যবস্থা করাই যখন তাদের কাছে সাধ্যাতীত ব্যাপার তখন উৎসবে যোগদান তো বাহুল্য মাত্র। ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে দেখে ফুল্লরার বারমাস্যা বিবরণ তাই মিথ্যা পাঁচালি মাত্র নয় বরং তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের বাস্তব উপলব্ধি।

বহুবিবাহ সেযুগে নিম্নবর্গীয়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না বোধ হয় অথবা থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গাঢ়তা অনেক বেশি ছিল। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকারবোধ ছিল। অসময়ে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হোত না তারা। সেইজন্য রূপসী যুবতী নারী বেশী দেবী চণ্ডীকে সপত্নী ভেবে কালকেতুর প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে ফুল্লরা -

> "পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে
> কাহার সোলস্যা কন্যা আনিয়াছ ঘরে।
> এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন
> আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কার রাবণ"[১৬]

ফুল্লরার এই নারীব্যক্তিত্বের পরিচয় আমরা 'বণিকখণ্ডে' দেখি না। ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়বার বিবাহে লহনার নিষ্ফল অভিমানই সার হয়েছে। বণিক কপট যুক্তি দিয়ে জানিয়েছে - "রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।"[১৭] স্বামীর প্রতি প্রেমের অধিকার লহনার ছিল না। নিঃসন্তান হওয়ায় তার দর কমে গিয়েছে। সংসারে এমন নারীর আশ্রয় পাওয়াই তার প্রাপ্ত অধিকারের চাইতে যেন অধিক ছিল। উচ্চবর্গের সমাজে নারীর প্রতি এই অমর্যাদার ছবি এখানে স্পষ্ট। লহনা ও ফুল্লরাকে পাশাপাশি রাখলে দুই সমাজের পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়।

এছাড়াও উচ্চবর্গের নারীরা নিজের ভরণ-পোষণের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী ছিল। অন্যদিকে নিম্নবর্গের নারী হওয়ায় 'ফুল্লরা পসার করে নগরে চাতরে'।[১৮] সে অনেক বেশি স্বাধীন। সংসার চালাতে স্বামীর উপর নির্ভরশীল নয় বরং সে স্বামীর কাজের সহায়ক।

অন্ত্যজ কালকেতুর উপর দেবী চণ্ডীর অহেতুক কৃপা তার স্বাধীন জীবনে যেন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কালকেতু তাই দেবীকে জানিয়েছে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী।"[১৯]

অস্পৃশ্য বলে তার ঘরে দেবী চণ্ডীর প্রতিষ্ঠিত মূর্তি পূজোর জন্য কোনো ব্রাহ্মণ আসবে না তা সে জানে -

"অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাড়।"[২০]

মধ্যযুগে রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যে অস্পৃশ্য ছিল তা বেশ স্পষ্ট। কালকেতু দেবীকে জানিয়েছে তাকে স্পর্শ করলে স্নান করা উচিত। বারবার নিজেকে 'নিচ জাতি' হিসেবে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে আছে কালকেতুর আজন্ম লালিত হীনমন্যতা। উচ্চকোটির সমাজ এই হীনমন্যতাবোধকে সৃষ্টি করেছে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের মনে। কালকেতু কখনই সেই বোধের বাইরে যেতে পারেনি। প্রতিভা ও দক্ষতার দ্বারাও যে সামাজিক মর্যাদা আদায় করা যায়, সেই চিন্তাধারাকে কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি বংশ কৌলীন্যের গর্বে অন্ধ উচ্চবর্গ। তাই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নীচ বংশের ভেবে কালকেতুর আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অশিক্ষিত, বন্য মানুষের সরলবিশ্বাসের সুযোগ নিত উচ্চবর্গের মানুষজন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুরারী শীল এমনই এক চরিত্র। নগদ দাম না মিটিয়ে কালকেতুর কাছে জিনিসপত্র কিনতে সে অভ্যস্ত ছিল। এই শঠ মুরারী শীলের কাছে কালকেতু দেবীপ্রদত্ত আংটির মুল্য নির্ধারণ করতে গেলে মুরারী তাকে ঠকাতে চেয়েছে। তার উদ্দেশ্য সফল না হলেও কালকেতুর মতো সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে যে মুরারী শীলের মতো ধূর্ত মানুষেরা লাভবান হতো তা বোঝা যায়।

কালকেতু ব্রাত্য জাতির হয়েও দেবীর কৃপা লাভ করেছে ও রাজা হয়েছে। এরূপ ঘটনা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদী সমাজে বিস্ময়জনক তো বটেই চরম অপ্রীতিকরও। তাই রাজা হলেও সে কখনো সমাজে মান্যতা পায়নি। কালকেতুও ভালো ভাবেই জানে - "নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন।"[২১] ধনবান হলেও সামাজিক মর্যাদা সে কখনোই লাভ করবে না। রাজা হওয়ার পরেও তাই ভাঁড়ুদত্তের মতো সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে কালকেতুকে অপমানিত হতে হয়েছে একাধিকবার। এক পতিত জাতির যুবককে রাজা হিসেবে মেনে নেওয়া ভাঁড়ুদত্তের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার জাত্যাভিমানে একথা কাঁটার মতো বিঁধেছে। কালকেতুর রাজা হওয়া তার কাছে নীচের স্পর্ধা মনে হয়েছে। কালকেতুকে তাই রাজত্বহীন করতে সে বদ্ধপরিকর। সে ঠিক করে -

"হাটে বদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি।
...
পুনর্বার হাটে মাস বেচাং ফুল্লরা।"[২২]

ভাঁড়ু চক্রান্ত করে কালকেতুর সাথে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ বাধিয়েছে। সামান্য এক ব্যাধ হয়েছে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী কলিঙ্গরাজও এ কথা মেনে নিতে পারেনি। কলিঙ্গরাজের উক্তিতে তার সেই জাত্যাভিমান ও ব্রাত্য হিসেবে কালকেতুর প্রতি তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত অশ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে -

"কাঠারিআ বেটা ছিল কলিঙ্গ-নৃপতি
ধন দিআ রাজা তারে কৈল ভগবতী।"[২৩]

রাজার উপযুক্ত সম্মান নয় বরং কলিঙ্গরাজ যেন এক অন্ত্যজ নিম্নবর্ণের মানুষকেই শিক্ষা দিতে চেয়েছে তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘনের।

মধ্যযুগীয় সমাজে বর্ণ বিভাজনের গুরুত্ব কতটা ছিল তা কালকেতুর নগরবিন্যাস রীতিতেই টের পাওয়া যায়। রাজা হয়ে কালকেতু সকল ধর্মের ও সমাজের মানুষকে তার নগরে বসতি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানায় কিন্তু তার অধিক আগ্রহ ছিল ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি -

"যত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চাষভূমি বাড়ি দিব দান।”[২৪]

কালকেতু তাই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বিনা খাজনায় বাসভূমি ও নিষ্কর চাষজমি দিতে চায়। কালকেতু তার ব্যাধজীবনে চতুর্বর্ণের বাইরের পতিত জাতি ছিল। কিন্তু যখনই সে রাজা হয়েছে তখনই সে উচ্চবর্ণের বর্ণভেদকে মান্যতা দিতে শুরু করেছে। রাজা হলেও সে যে সমাজের চোখে অন্ত্যজ তা বুঝেই নিজ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বোধহয় তার এই প্রচেষ্টা। কালকেতুর নগরের কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ জাতি বসবাস করেছে। এরপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সবশেষে নগর প্রান্তে বসে চণ্ডাল, কিরাত, ধীবর, কলু, বাইতি, কেওরা, পাটনি প্রভৃতি জাতির মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় হল অন্ত্যজ, পতিত জাতির রাজার রাজত্বেও এই সমস্ত অস্পৃশ্য মানুষের ঠাঁই হয় না নগরের কেন্দ্রে বাস করার অথবা তারা পায় না ব্রাহ্মণ প্রজার মতো নিষ্কর জমি। কালকেতু নিজে রাজা হয়েও কেবল ‘ব্রাহ্মণের দাস’[২৫] হয়ে থাকতে চেয়েছে। সমাজের নজরে উঁচু হওয়ার জন্য অনার্য দেবীর মতো এও যেন নিম্নবর্ণের মানুষের উচ্চবর্ণের সাথে মিলিত এক চুক্তি।

৪

মঙ্গলকাব্যের দুই ভিন্ন কাহিনিতে দুই দেবীর মাহাত্ম্য কথার আড়ালে এইভাবেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির লৌকিক জীবন সংগ্রাম। উচ্চবর্ণের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কখনো সেই সংগ্রামে মিলিত হয়েছে সমাজের সকল অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাদের সংস্কৃতিকে সার্বিক মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে। আবার, কখনো নিম্নবর্গের কোনো একক ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা টিকিয়ে রাখার লড়াই চলেছে উচ্চবর্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে উচ্চবর্গ লালিত সামাজিক নিয়ম কানুনের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর তাই অন্ত্যজ, পতিত তথা দলিত শ্রেণির আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত সংগ্রামের কাহিনিরই এক ক্ষণের সাক্ষী হল ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ১১
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২২৭
৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭০
৪. নস্কর, সনৎ (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৫
৫. তদেব, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ২৩৮
৭. তদেব, পৃ. ১১৪
৮. তদেব, পৃ. ১২৩
৯. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৮৩
১০. ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার (সংকলক), বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, বাণী নিকেতন, কলকাতা, ১৩৩৫, পৃ. ১০৯
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৬
১২. সেন, সুকুমার (সম্পা), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৬
১৩. তদেব, পৃ. ৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ৬১
১৫. তদেব, পৃ. ৬১
১৬. তদেব, পৃ. ৬২
১৭. তদেব, পৃ. ১১৯
১৮. তদেব, পৃ. ৪৫
১৯. তদেব, পৃ. ৬৩
২০. তদেব, পৃ. ৬৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২১. তদেব, পৃ. ৬৫
২২. তদেব, পৃ. ৮৫
২৩. তদেব, পৃ. ৯২
২৪. তদেব, পৃ. ৭৭
২৫. তদেব, পৃ. ৭৭

Bibliography:

সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, ২০১৭
নস্কর, সনৎ (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭
বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯
বিশ্বাস, অচিন্ত্য, (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০২
ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার, (সংকলক) বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, বাণী নিকেতন, কলকাতা, ১৩৩৫
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২০
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালের যাত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৭৮
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৩৯
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫
রায়, দেবেশ, (সম্পাদক ও সংকলক), দলিত, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা ২০০৪
মণ্ডল, চিত্ত এবং প্রথমা রায় মণ্ডল, (সম্পা.), দলিত সাহিত্য, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩
বেরা, জয়দেব (সম্পা.), দলিত, নায়রা বুকস, বিষ্ণুপুর, ২০২০
পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯
মণ্ডল, সন্দীপ, মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫
রায়, বিশ্বনাথ (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪